একক ১ ❑ আদি মধ্যযুগ : সংজ্ঞা ও পরিধি – প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ

গঠন :

১.০ আদি মধ্যযুগ : সংজ্ঞা ও পরিধি
১.১ প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ
১.২ অনুশীলনী
১.৩ গ্রন্থপঞ্জী

১.০ আদি মধ্যযুগ : সংজ্ঞা ও পরিধি

ভারতীয় ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সভ্যতার আদি মধ্যযুগের ধারণা প্রধানত মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের চিন্তাভাবনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তাঁরা মার্কস কর্তৃক আলোচিত এশিয়ার অন্যান্য সমাজব্যবস্থার সাথে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতের পরিবর্তনবিমুখ সমাজ, অর্থনীতি ও উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য খন্ডন করেছেন। এইসব ঐতিহাসিকগণ ইউরোপীয় ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসের যুগবিভাজনকে গ্রহণ করেছেন যার মূল কথা হল সমাজের অভ্যন্তরীণ কার্যধারার গতিশীল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক বিবর্তন ঘটে। মূলত এই পরিবর্তন সাধিত হয় উৎপাদন সম্পর্ক ও প্রকৃতির মধ্যে। মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের অনেকেই প্রথমদিকে যান্ত্রিকভাবে প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছেন। এর ফলে সাধারণভাবে সমাজের প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে উত্তরণের ধারণার প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বিতর্কিত বিষয়টি হল মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের দ্বারা সৃষ্ট এক সাধারণ ধারণা যে, প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, আদর্শ, ধর্ম ও রাজনীতির সহজাত গঠনে এক গুণগত পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন আদি বা প্রাচীনযুগ এবং মধ্যযুগের বিভাজনের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করে। এই পর্যায়ের সামাজিক পরিবর্তনের চরিত্রের সঙ্গে শাসকগণের রাজবংশ বা শাসকগণ কর্তৃক অনুসৃত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা ঠিক হবে না। তাই বিখ্যাত মার্কসবাদী ঐতিহাসিক বি. এন. দত্ত, ডি. ডি. কোশাম্বী এবং আর. এস. শর্মার প্রশংসনীয় গবেষণার ফলশ্রুতি হল পূর্ববর্তী জেমস মিল এবং তাঁর উত্তরসূরী ইউরোপীয় প্রাচ্যবাদী এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী পন্ডিতদের ভারত ইতিহাসের যুগবিভাজনের ধারণাকে নাকচ করা।

১.১ প্রাচীন থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ

ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করতে গেলে আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে কেন 'আদি মধ্যযুগ' বলা হবে? বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৭ সালের ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন। নীহাররঞ্জন রায় মধ্যযুগের তিনটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। তাঁর মতে শাসকগণের বংশ বা তাঁদের অনুসৃত ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যযুগের ঐতিহাসিক পর্যায়কে প্রাচীন ও আধুনিক যুগ থেকে পৃথক করা যায় না।

Scanned by CamScanner

প্রথম সহস্র বছরের পর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের চরিত্র বিশ্লেষণ করে তিনি মধ্যযুগের তিনটি পর্যায়ের নমুনা তুলে ধরেছেন। প্রথম পর্যায় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায় দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম চার দশক পর্যন্ত এবং শেষ পর্যায়ের পরিধিকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম চার দশক থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে গবেষকদের আলোচনা ভারত ইতিহাসের যুগবিভাজনের আরও অর্থবহ ধারণা তুলে ধরেছে। যাই হোক এটি স্পষ্ট যে, নীহাররঞ্জন রায় কর্তৃক আখ্যায়িত প্রথম পর্যায় একদিকে প্রাচীন ও অপরদিকে মধ্যযুগ থেকে পৃথক একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে ভূষিত। ভারত ইতিহাসের প্রতি এই সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত ঘটে ঐতিহাসিক বিবর্তনের এক পরিবর্তনশীল গতিপথ অন্বেষণের মাধ্যমে। এই দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণার সঙ্গে ভারতের মধ্যযুগে রূপান্তরের ধারণাকে যোগ করেছে। এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটে ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সময় থেকে যিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে শ্রেণিসংঘাত ও সামন্ততন্ত্রের উদ্ভবের উল্লেখ করেছেন। ডি. ডি. কোশাম্বীও বলেছেন যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন বোধগম্য করতে সামন্ততন্ত্রের উদাহরণ ব্যবহৃত হয়, যা ইতিহাসের নতুন পর্যায় অনুধাবনে যুক্তির সঞ্চার করে। কোশাম্বী তাঁর "Stages of Indian History" নিবন্ধে স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন এবং পরবর্তীকালে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের বিবর্তনের দ্বি-স্তরীয় পর্যায়কে আরও বিকশিত করেছেন। তিনি ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের গুণগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের গুণগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। যাই হোক তাঁর ভারত ইতিহাসের বিবর্তনমূলক পরিকাঠামোয় পঞ্চম পর্যায়টি সুনিশ্চিতভাবে 'শুদ্ধ সামন্ততন্ত্র' নামে চিহ্নিত, যার সূত্রপাত গুপ্তোত্তর যুগে এবং ১২০০ সালের পর মুসলিম বাণিজ্যিক ও সামরিক অনুপ্রবেশের পর যা আরও উদ্দীপিত হয়। এটি নীহাররঞ্জন রায়-যাকে মধ্যযুগের প্রথম পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন তার সঙ্গে মানানসই হয়েছে। এই নতুন পর্যায় যাকে আদি মধ্যযুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে সেটি কোশাম্বীর মতানুসারে সামন্ততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য-আশ্রিত। এই ধারণা পরবর্তীকালে আর. এস. শর্মা কর্তৃক পরিবর্তিত বা বি. এন.এস যাদব, ডি.এন.ঝা., বিশ্বমোহন ঝা, আর. এন. নন্দী. এবং আরও অনেক গবেষক যেমন হরবংশ মুখিয়া, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের দ্বারা প্রশস্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁরা এটিকে আরও ব্যাপক ভিত্তি সমন্বিত সামাজিক বিবর্তনের অন্তর্নিহিত উদাহরণ হিসেবে দেখেছেন। প্রকৃত বিষয় হল এই নতুন পর্যায় বিবর্তিত হয়েছে গুপ্তোত্তর যুগের মধ্যবর্তীকাল থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজপুতদের উত্থান পর্যন্ত। এই পর্যায় বিগত আদি পর্যায়ের থেকে বিচ্যুত হলেও সম্পূর্ণভাবে মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু এর মধ্যে মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্যের সুপ্ত বীজ নিহিত ছিল। সুতরাং পূর্বের প্রাচীন ভারতকে দুটি যুগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি আদি ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক পর্যায় এবং দ্বিতীয়টি আদি মধ্যযুগ যার ব্যাপ্তি ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া মধ্যযুগের পূর্ব পর্যন্ত।

সুতরাং আদি মধ্যযুগ ভারতের ইতিহাসে একটি সাংস্কৃতিক পর্যায় যা কয়েকটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ এবং যা এই যুগকে মধ্যযুগ থেকে পৃথক করেছে। ভারত ইতিহাসের বিবর্তনের একটি নতুন স্বচ্ছ পর্যায়কে আদিমধ্য যুগ আখ্যা দেওয়ার প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, এক সাংস্কৃতিক পর্যায় থেকে অপর পর্যায়ে ঐতিহাসিক বিবর্তন হল একটি অন্তর্নিহিত পদ্ধতি যা সমাজের অন্তর্নিহিত উপাদানগুলির অন্তর্নিহিত গতিশীলতার দ্বারা সংঘটিত। এই বিবর্তন সংঘটিত হবার ক্ষেত্রে কোন উপাদান দায়ী তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধ হতে পারে। কোশাম্বীর মতে, এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রধান যে বিষয়টি কার্যকরী ছিল তা হল উৎপাদন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে ইতিহাসে কালের সীমানা নির্দিষ্ট হবে যুদ্ধ বা বংশগত পরিবর্তনের দ্বারা নয়, হবে উৎপাদনের উপায় ও সম্পর্ক অনুযায়ী।

কোশাম্বী স্বীকার করেছেন যে, বড় যুদ্ধ, শাসকশ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, ধর্মীয় অভ্যুত্থান জনগণের উৎপাদনশীল

Scanned by CamScanner

সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু সেটি সংশ্লিষ্ট সমাজের অনুন্নত অবস্থার জন্য যেখানে সঠিক সামাজিক শক্তি যা ঐতিহাসিক বিকাশের নেপথ্যে কাজ করে, সেই শক্তি সুপ্ত থাকে। কোশাম্বী ইতিহাসের বিবর্তনে মার্কসবাদী ব্যাখ্যার উপর জোর দিয়েছেন এবং সেই ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে আর. এস. শর্মা ও অন্যান্যরা গ্রহণ করেছেন। এঁরা সামন্ততন্ত্রের ভারতীয় ধারণার উপর ভিত্তি করে আদি মধ্যযুগের অস্তিত্ব নিরূপণ করেছেন। কোশাম্বী ও শর্মা কর্তৃক আদি মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি শুরু হয় কয়েকটি বিষয় নিয়ে যা প্রশাসন এবং তদানীন্তন জীবনধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রের উপর অন্যান্যদের অবদানের সঙ্গে সম্পর্কিত।

অপরদিকে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আদি মধ্যযুগকে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আবার হরবংশ মুখিয়া ভারত ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে কোন সাংস্কৃতিক পর্যায়কে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সামন্ততন্ত্র বিষয়ক আলোচনাকে অপ্রতুল বলে মনে করেছেন। তাঁর সম্পাদিত 'The Feudalism Debate' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তিনি তত্ত্বগত ও পরীক্ষামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। এমনকি বিতর্কের ক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করে ভারতে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ গঠনে স্বাধীন কৃষি অর্থনীতির ভূমিকাকে প্রশ্ন করেছেন যা মধ্যযুগের ভারতকে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজ ও অর্থনীতি থেকে পৃথক করেছে।

'আদি মধ্যযুগ' সম্পর্কিত যুগবিভাজন সাধারণভাবে গৃহীত হলেও সাংস্কৃতিক পর্যায়কে যে সমস্ত বিষয় স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে তা নিয়ে মার্কসবাদী ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আবার পূর্বতন পণ্ডিতবর্গের মধ্যেও বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

১.২ অনুশীলনী

১. ভারত ইতিহাসের আলোচনায় 'আদি মধ্যযুগ'কে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
২. ভারত ইতিহাসে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে উত্তরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

১.৩ গ্রন্থপঞ্জী

১. D.N. Jha : Early India - A concise History
২. D.N. Jha (ed.) : The Feudal Order
৩. D.D.Kosambi : An Introduction to the study of Indian History
৪. R.S. Sharma : Indian Feudalism
৫. R.S. Sharma : Social Changes in Early Medieval India
৬. B.D.Chattopadhyay : The Making of Early Medieval India

Scanned by CamScanner

একক ১ ❑ আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ

গঠন

০.১ প্রস্তাবনা

১.১ প্রাক্কথন

১.২ ভাষার ইতিবৃত্ত

১.২.১ আঞ্চলিক ভাষা ও লিপির উদ্ভব

১.৩ সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

২.০ প্রাচীন বাংলায় সাহিত্যের ভাষা ও ক্রমবিকাশ

৩.০ দক্ষিণ-ভারত : আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য : তামিল

৩.১.১ দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

৪.০ আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব ও সাহিত্যের বিকাশ : পূর্বভারত

৫.০ পশ্চিম ভারত : গুজরাটী ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ

৬.০ উত্তর ভারত : আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

৭.০ কথান্ত

৮.০ অনুশীলনী

৯.০ গ্রন্থপঞ্জী

০.১ প্রস্তাবনা

খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কলসীমাটিকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় নিয়োজিত ঐতিহাসিকরা সাধারণভাবে আদি মধ্যযুগ নামে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের পাঠ্যনির্দিষ্ট সময়কালটি হল খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত, যাকে মোটামুটিভাবে আদি-মধ্যযুগের অন্তর্গত কাল রূপে গণ্য করা যেতে পারে।

আদি মধ্য যুগটি বিভিন্ন কারণে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আলোচ্য কালপর্বটির ব্যাখ্যা নিয়েও ঐতিহাসিক মহলে মতদ্বৈততা আছে। এই এককটিতে আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কালে আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল এবং তার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

Scanned by CamScanner

১.১ প্রাক্-কথন

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে বিশেষত গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক স্থানীয় শক্তি প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এই প্রবণতা তুর্কী আক্রমণের সময় পর্যন্ত বিশেষ সক্রিয় ছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই খণ্ডীকরণ স্বভাবতই আঞ্চলিকতার বাতাবরণ তৈরী করে। ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতি তার ব্যতিক্রম নয়। এই উপমহাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনচর্যায় অনিবার্যভাবে তাই আঞ্চলিকতার প্রভাব এবং তার ক্রমবিকাশ আমরা প্রত্যক্ষ করি।

রাজনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রবণতাটি ছিল মৌর্য রাজবংশের প্রবর্তিত কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। গুপ্ত রাজত্বকালে ভারতবর্ষে একটি খণ্ডীকৃত রাজনৈতিক কাঠামো ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হয়। এই সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। থানেশ্বর ও কনৌজকে কেন্দ্র করে হর্ষবর্ধন গড়ে তোলেন এক বিশাল সাম্রাজ্য যা তাঁকে 'উত্তরাপথনাথ' অভিধায় ভূষিত করে। কিন্তু হর্ষের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সেই সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়—সারা উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তার করে অগণ্য আঞ্চলিক শক্তি। অষ্টম শতকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিম ভারত ও উত্তর ভারতের একাংশ নিয়ে গড়ে ওঠে গুর্জর—প্রতিহার সাম্রাজ্য। পূর্বভারত ও উত্তর ভারতের অবশিষ্টাংশ নিয়ে গড়ে ওঠে পাল সাম্রাজ্য। একই সময়ে রাষ্ট্রকূটরা দাক্ষিণাত্য তথা সমগ্র দক্ষিণ ভারত জুড়ে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এইভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার ক্রমবর্ধমান বিভাজন আঞ্চলিক শক্তির প্রভাববৃদ্ধির সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, আলোচ্য কালসীমায় ব্যাপকহারে ভূম্যধিকারের হস্তান্তর এবং একটি ভূম্যধিকারী শ্রেণীর উত্থান লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণদের এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভূমিদান বহু আগে থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। কিন্তু গুপ্তোত্তর যুগে ব্যাপকভাবে ভূমি হস্তান্তরের প্রথার অনুশীলন শুরু হয়। এর ফলস্বরূপ কালক্রমে একটি সম্পন্ন ও শক্তিশালী ভূম্যধিকারী শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যারা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আলোচ্য কালপর্বের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল জাতির বিস্তার। জাতিবিস্তারের পদ্ধতি উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণদের মধ্য থেকেই। বৈদিক শিক্ষারীতির পাশাপাশি গোত্র, প্রবর, গ্রাম পরিচিতি প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে ব্রাহ্মণ্য সমাজে অসংখ্য জাতি, উপজাতির সৃষ্টি হয়। সমসাময়িক সাহিত্যে নিশ্চিতভাবে তার প্রভাব পড়ে। ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্গত রাজপুত জাতি এই সময় বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, রচিত হয় রাজপুতজাতি কেন্দ্রিক সাহিত্য। তৎকালীন স্মৃতিশাস্ত্রসমূহে শূদ্রদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করি। আর্যীকরণের ফলে বহু উপজাতিয় জনগোষ্ঠী শূদ্র হিসাবে ব্রাহ্মণ্য সমাজে প্রবেশ করে। বহু পেশাদার কারিগর গোষ্ঠী জাতিতে রূপান্তরিত হয়—সমাজ বহুধাবিভক্ত জাতিব্যবস্থার অনুসারী হয়ে ওঠে।

ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলি এ সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে। ধর্মের ক্ষেত্রে ভক্তিবাদ বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশৈলীতে আঞ্চলিকতার প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। অধ্যাপক

Scanned by CamScanner

রামশরণ শর্মার মতে সমগ্র ভারতবর্ষ যে অসংখ্য রাজনৈতিক এককে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে; সেগুলি ছিল একে অপরের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন। তাঁর মতে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে দশম শতকের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলগুলির মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন কমে আসার ফলে আঞ্চলিকতার ধারণা ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে।

১.২ ভাষার ইতিবৃত্ত

বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে আলোচনার আগে ভারতবর্ষে ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তন প্রসঙ্গে একটি প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভাষা হল এমন এক বাঙ্ময় স্বনির্ভর সংকেতধর্মী প্রকাশ যার রীতিসিদ্ধ প্রচলিতি গড়ে ওঠে সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে। কতকগুলি ধ্বনি বা অক্ষর সমবায়েই ভাষা রচিত হয় না। সেগুলি যদি কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর নিকট বিশেষ অর্থবহ হয়ে ওঠে, তখনই তাকে বলা যায় 'ভাষা'। এই জন্যই ভাষা 'রীতিসিদ্ধ'। ভাষা হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়জগতের নিরবয়ব ধারণার প্রতীক। ভাষার আর একটি লক্ষণ হল যে এটি বাঙ্ময়। ভাষার অর্থবহ প্রকাশ নানাভাবেই ঘটতে পারে যেমন অঙ্গভঙ্গি বা ইঙ্গিত দ্বারা, লিখিত রচনার মাধ্যমে অথবা কোনো বিশেষ চিহ্নের দ্বারা। 'ভাষা' অর্থে কিন্তু প্রধানত বাঙ্ময় প্রকাশকেই বুঝতে হবে। কারণ, শ্রোতা ও বক্তার ব্যক্তিমানস, জীবনবোধ, মনস্তাত্ত্বিক বিক্ষেপ অথবা চিন্তানির্ভর দ্বান্দ্বিক প্রত্যয় ইত্যাদি কেবল বাঙ্ময় প্রকাশেই উন্মীলিত হয়। ভাষার আশ্রয় হল সমাজ। সমাজভুক্ত ভাষাভাষীর সহযোগ, মনোভঙ্গি এবং প্রতিক্রিয়া হল ভাষার দৃঢ়মূল ভিত্তি। অপরদিকে জনজীবনের ইতিহাস, চরিত্র, মানসিকতা অথবা সমাজসত্ত্বার অভিজ্ঞতা অন্তঃপুরেই সঞ্চিত হতে থাকে। তাই ভাষা যেন এক 'সামাজিক চুক্তিবিশেষ'।

১.২.১ আঞ্চলিক ভাষা ও লিপির উদ্ভব

আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতক থেকে বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের যে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় তা থেকে অনুমান করা যেতে পারে মৈথিলী, গুজরাটি, রাজস্থানী, বাংলা প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষা সেই সময়েই তার প্রাথমিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সমসাময়িক সাহিত্য থেকে যেমন আদি অসমীয়া, আদি বাংলা, আদি ওড়িয়া বা আদি মৈথিলী ভাষার ক্রমবিবর্তনটি লক্ষ্য করা যায় তেমনই পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক চালচিত্রের বিবরণ পরিস্ফুট হয় বৌদ্ধ বজ্রযান সাহিত্যে। জৈন প্রাকৃত সাহিত্য থেকে পশ্চিম ভারতের সংস্কৃতিগত বিবর্তনের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। অনুমানের ওপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে, অগ্রহার প্রথার ব্যাপক প্রচলনে খৃষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতক থেকে যে সব ব্রাহ্মণ দানগ্রহীতা উত্তর ভারত থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ব্রহ্মদেয় বা ঐ জাতীয় নিষ্করভূমিতে বসবাস ও জীবিকা অর্জনের জন্য পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁরাই আদি প্রাগার্য উপভাষা এবং প্রচলিত আর্যভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের বিভিন্ন রূপের সংমিশ্রণ ঘটান, যা বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের সহায়ক হয়ে ওঠে।

শুধুমাত্র উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলেই নয়, দাক্ষিণাত্যে আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্যও কম ছিল না। সংস্কৃত অভিজাত শ্রেণীর ভাষা হিসাবে সমাজের উচ্চকোটির মানুষের মধ্যে ব্যবহৃত হলেও সাধারণ জনসমাজে কানাড়া ভাষা বহুল ব্যবহৃত হত বলে জানা যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের একটি চালুক্য লেখতে

Scanned by CamScanner

তার সমর্থন আছে। প্রাকৃতের পরিবর্তে তামিল ভাষাকে দৈনন্দিন কথোপকথনের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেছিলেন দাক্ষিণাত্যের জৈন ধর্মগোষ্ঠী।

এবার লিপির প্রসঙ্গে আসা যাক। সংস্কৃত লিপ্ ধাতু থেকে 'লিপি' শব্দটির উৎপত্তি। লিপ্ ধাতুর অর্থ লেপন করা। প্রাচীন ভারতবর্ষে ভূর্জপত্রে ও তালপত্রে ধাতুনির্মিত সূক্ষ্মাগ্র কলমদ্বারা দাগ কেটে তার ওপর কালি মাখিয়ে দেওয়া হত। এই রঞ্জক পদার্থ লেপন করা থেকে 'লিপি'র উৎপত্তি।

অশোকের গিরি অনুশাসনে ব্রাহ্মী হরফে লিপি শব্দটি অন্তত ছয়বার উৎকীর্ণ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে 'লিপি'-র স্থলে 'দিপি' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের উৎকীর্ণ গিরি অনুশাসনে ভারতীয় লিপির দুইটি ধারা দেখা যায়—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে খরোষ্ঠী এবং অন্যান্য অঞ্চলে ব্রাহ্মী লিপি। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর আর খরোষ্ঠী লিপির সন্ধান পাওয়া যায় না:, ব্রাহ্মী সর্বভারতীয় লিপি হয়। ব্রাহ্মী বাম থেকে দক্ষিণে লিখিত।

উত্তর ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মীলিপির স্বতন্ত্র ধারার বিবর্তন ঘটেছে। উত্তরভারতে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে কুষাণ রাজত্বকালে ও চতুর্থ-পঞ্চম শতকে গুপ্তযুগে ব্রাহ্মীলিপির পরিবর্তন ঘটে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর ও পূর্ব ভারতের ব্রাহ্মীলিপি অঞ্চলভেদে তিনটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে, এগুলি হল ১. 'শারদা' লিপি (উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর-পাঞ্জাব অঞ্চলে), ২. 'নাগর' লিপি (দক্ষিণ-পশ্চিমে গুজরাট রাজপুতনা মালবে এবং মধ্যদেশে), ৩. 'কুটিল' লিপি (পূর্বভারতে)। গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ ও রাজপুত রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় সমগ্র উত্তরভারতে, নাগরী লিপির প্রসার ঘটেছিল। 'নাগর' থেকে পরবর্তীকালে দেবনাগরী, গুজরাটী, কায়থী লিপির উৎপত্তি; শারদা লিপি থেকে কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে গুরুমুখী এবং কুটিল লিপি থেকে বাংলা, মৈথিল, অসমীয়া, ওড়িয়া ও নেপালী লিপির উদ্ভব। প্রায় সহস্রাব্দ পূর্বে বাংলা ও দেবনাগরী লিপি নিজস্বরূপ গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মীলিপি স্বতন্ত্র ধারায় বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন লিপির মধ্য দিয়ে কালক্রমে তামিল, তেলেগু, কানাড়ী, মালয়ালম্ প্রভৃতি লিপিতে পরিণত হয়েছে।

১.৩ সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ধর্মের বাহন হল সংস্কৃত ভাষা। কাল ও ভাব অনুযায়ী এই ভাষার দুটি স্তর—একটি বৈদিক সাহিত্যের ভাষা, অপরটি বৈদিকোত্তর সাহিত্যের ভাষা। সাধারণভাবে দ্বিতীয় স্তরটির ভাষাই সংস্কৃত বা Classical sanskrit নামে পরিচিত। সংস্কৃত ভাষার মূল হল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা এবং সেই সূত্রে ইউরোপের গ্রীক, লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার সঙ্গে এই ভাষার যোগ নিবিড়। ইরাণের প্রাচীন আবেস্তীয় ভাষা ও প্রাচীন পারসিকের সঙ্গেও সংস্কৃত ভাষা সম্পর্ক যুক্ত।

সমগ্র সংস্কৃত রচনাবলী মোটামুটিভাবে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত, যেমন, সাহিত্য, দর্শন, তন্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যকে যুগপর্যায় অনুসারে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে—বৈদিক যুগ, মহাকাব্য এবং পুরাণের যুগ, ক্লাসিকাল বা পাণিনির পরবর্তী যুগ।

Scanned by CamScanner

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের রচনা বা সংকলনকাল ধরা হয় আনুমানিক ১৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। বৈদিক সাহিত্য চারটি পর্যায়ে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। বেদ চারটি—ঋক্, সাম ও যজুঃ এবং অথর্ব। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে আছে বিবিধ যজ্ঞকার্যের বিবরণ ও ব্যাখ্যা, কিছু কিছু প্রাচীন উপাখ্যানের সন্নিবেশ। ব্রাহ্মণেরই পরিশিষ্ট উপনিষদ। আরণ্যকগুলিতে কর্মকাণ্ডের সহিত জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা আছে। ঋগ্বেদের প্রধান ব্রাহ্মণ হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। বিখ্যাত ছান্দোগ্যপনিষদ সামবেদের অন্তর্গত। শুক্লযজুর্বেদের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ হল শতপথ ব্রাহ্মণ।

শব্দজ্ঞানের জন্য রচিত হয় ব্যকরণ, ব্যকরণসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম হল পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক), কাত্যায়ন (সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) অষ্টাধ্যায়ীতে 'বার্তিক' নামক কয়েকটি সূত্র সংযোজিত করেন। পতঞ্জলি (খৃষ্টপূর্ব ২য় শতক) সমগ্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন 'মহাভাষ্য' নামক গ্রন্থে। পরবর্তীকালে যে সমস্ত ব্যকরণ লেখা হয় তার মধ্যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে রচিত বোপদেবের মুগ্ধবোধ উল্লেখযোগ্য। আলংকারিকদের মধ্যে দণ্ডী (আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক), ভামহ (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক), আনন্দবর্ধন, মম্মট, বিশ্বনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভরতের নাট্যশাস্ত্র, খৃষ্টীয় দশম শতকে রচিত ধনঞ্জয়ের দশরূপ প্রভৃতির নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। যজ্ঞকাল নির্ধারণের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল।

রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের দুইটি প্রাচীন মহাকাব্য। এই মহাকাব্যদ্বয় কোনো নির্দিষ্ট একটি যুগে বা একই ব্যক্তির দ্বারা রচিত নয়। উভয় গ্রন্থেই পরবর্তীকালের সংযোজন আছে। ভারতবর্ষের এই আদিকাব্য দুটি ঠিক কোন সময়ে তাদের প্রাথমিক রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা বলা কঠিন। তবে অনুমান করা যেতে পারে মহাভারতের বর্তমান রূপটি সম্ভবত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক বা তার নিকটবর্তী কোনো সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছিল। তবে রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ হয় মহাভারতের এক বা দুই শতক পূর্বে। রামায়ণের প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডের সম্পূর্ণ এবং ষষ্ঠ কাণ্ডের কিছু অংশ প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন বহু পণ্ডিত। রামায়ণের কবি বাল্মীকি এবং মহাভারতের কবি বেদব্যাস বলে প্রসিদ্ধি আছে। 'ভগবদ্গীতা' মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত এবং জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিমার্গের নির্দেশক হিসাবে যুগোত্তীর্ণ সাহিত্যরূপে পরিগণিত। পুরাণ গ্রন্থগুলির সংখ্যা প্রচুর। দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, অলংকার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই পুরাণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পৌরাণিক কাহিনী অনেক কাব্য নাটকের উপজীব্য।

পাণিনির কালকে (আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতক) ক্ল্যাসিকাল যুগের প্রারম্ভ বলে ধরা হয়। এই যুগের কাব্যগ্রন্থগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। রূপক ও উপরূপক শ্রেণীর নাট্যগ্রন্থাবলী দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত। শ্রব্যকাব্য ত্রিবিধ—পদ্য, গদ্য এবং চম্পু। দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি বহু বিষয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

কালিদাস-পূর্ব যুগের প্রসিদ্ধ কবি বা নাট্যকার অশ্বঘোষ ও ভাস। অশ্বঘোষ (আনুমানিক খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক) দুইখানি কাব্য রচনা করেন। এগুলি হল 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ'। তিনি একখানি বড় নাটকও (প্রকরণ) লিখেছিলেন, যার নাম 'শারিপুত্র'। ভাসের কাল অজ্ঞাত, তবে তাঁর নামে অনেক

Scanned by CamScanner

গ্রন্থ প্রচলিত আছে, যার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল 'স্বপ্নবাসবদত্তা'। কালিদাস আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কাব্য এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্', 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' প্রভৃতি নাটক রচনা করে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার হিসাবে বিবেচিত হন। কালিদাস উত্তর যুগের সুপ্রসিদ্ধ কবি বা নাট্যকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 'কীরাতাজুনীয়ম'-এর কবি ভারবি (খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক), 'শিশুপাল বধ'-এর রচয়িতা কবি মাঘ (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক), 'মৃচ্ছকটিকম'-এর লেখক শূদ্রক, 'উত্তররামরচিত' প্রভৃতি নাটক প্রণেতা ভবভূতি (খৃষ্টীয় অষ্টম শতক), 'মুদ্রারাক্ষস'-এর নাট্যকার বিশাখদত্ত (খৃষ্টীয় অষ্টম শতক), 'রত্নাবলী' প্রভৃতির কবি রাজা হর্ষ (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক), 'রাবণবধ' বা ভট্টিকাব্য'-এর কবি ভট্টি (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক), 'জানকীহরণ' -এর কবি কুমারদাস (আনুমানিক খৃষ্টীয় সপ্তম শতক), 'নৈষধচরিতের'র কবি শ্রীহর্ষ (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক) প্রভৃতি। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে কহ্লন, বিহ্লন, জয়দেব, রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। 'দশকুমারচরিত'-এর লেখক দণ্ডী, 'বাসবদত্তা'র লেখক সুবন্ধু (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) এবং 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত'-এর লেখক বাণভট্ট বিখ্যাত গদ্যকাব্য রচয়িতা। গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত চম্পূকাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম ত্রিবিক্রমভট্টের (আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতক) 'নলচম্পূ' বা 'দময়ন্তীকথা' ও 'মদালসাচম্পূ'। ভোজের নামে প্রচলিত 'রামায়ণচম্পূ' সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। স্বীয় ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে জৈনগণ কিছু চম্পূকাব্য রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া ধর্মশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান সাহিত্য সে যুগে রচিত হয়েছিল।

২.০ প্রাচীন বাংলায় সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

আর্য-সংস্কৃতির ক্রমবিস্তারের পূর্বে প্রাচীন বঙ্গভূমিতে সাহিত্য বলতে যা বোঝায় তার কোনো অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করার সপক্ষে কোনো তথ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তবে এটুকু ধারণা করা যেতে পারে, প্রাচীন বাংলার বিস্তীর্ণ স্থলভূমিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কিছু আর্য বসতি গড়ে উঠেছিল যার প্রভাবে বাংলাদেশের উচ্চবর্ণজ কিছু সামাজিক জনগোষ্ঠীর সংকীর্ণ পরিমণ্ডলে আর্যভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন আরম্ভ হয়।

প্রাচীন বাংলায় আর্যভাষার ব্যবহারের প্রথম এবং অভ্রান্ত প্রমাণ পাওয়া যায় একটি প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে। এটি হল বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলার মহাস্থান থেকে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরলেখ, যা আনুমানিক তৃতীয় খৃষ্টপূর্ব শতকে ব্রাহ্মলিপি এবং প্রাকৃতভাষায় লিখিত হয়। আমরা আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক নাগাদ সময়কালে উৎকীর্ণ আর একটি লিপির সন্ধান পাই বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে। এটি সংক্ষিপ্ত লিপি, সংস্কৃত ভাষায় রচিত। উপরিউক্ত লিপিদ্বয় প্রাচীন বাংলায় খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই অন্ততপক্ষে একটি সীমায়িত জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাকৃত ও সংস্কৃতের ব্যবহার বা প্রচলন হয়েছিল এই ধারণার ইঙ্গিত বহন করে ঠিকই তবে এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে ওই অঞ্চলে সংস্কৃত বা প্রাকৃতভাষার ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়।

Scanned by CamScanner

খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে প্রাচীন বাংলার পুন্ড্রবর্ধন অঞ্চলে (উত্তরাংশ) বহু সংখ্যক ভূমিদান লেখ উৎকীর্ণ হয়; এই লেখমালা সংস্কৃতে রচিত, গদ্যাকারে লিখিত এই সকল দানপত্রে সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষতা নজরে পড়ে তবে তাদের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নেই। তবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমদিক থেকে যে সকল লিপি উৎকীর্ণ হয়েছিল, তাদের কয়েকটিতে উচ্চমানের সংস্কৃত কাব্য রীতির উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখা যায়। অনুমান করা যেতে পারে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে এই সাহিত্যকে উৎকর্ষতার চরম শিখরে আরোহণে সহায়ক হয়ে দাঁড়ায়। আলোচ্য কালপর্বে প্রাচীন বাংলা যে সংস্কৃত ও সংস্কৃতিচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ মেলে বৈদেশিক বিবরণীগুলিতে। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক) বৌদ্ধ পুঁথিপত্র অধ্যয়ন এবং অনুলিপির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে দীর্ঘ দুই বৎসর তাম্রলিপ্তি (অধুনা মেদিনীপুর জেলার তমলুক) প্রদেশে অতিবাহিত করেন। অপর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) জ্ঞানচর্চার বহু কেন্দ্রের উল্লেখ করেছেন যা তৎকালীন বাংলাদেশে অবস্থিত ছিল, তিনি বিদ্যোৎসাহী বাংলাদেশের অধিবাসীদের ভূয়সী প্রশাংসাও করেছেন তাঁর ভারত ভ্রমণ বিবরণীতে। পরবর্তীকালে ই-চিং, চীনদেশ থেকে তাম্রলিপ্তিতে এসেছিলেন সংস্কৃত শিক্ষাগ্রহণের মহান ব্রত নিয়ে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতচর্চার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি বাংলাদেশে অন্ততপক্ষে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকেই ক্রমঃবিকশিত হয়েছিল এ কথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ইতিহাসে রয়েছে।

হর্ষচরিতের লেখক বাণভট্ট (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) প্রাচীন বাংলার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছেন তাঁর রচনায়। তথাপি এই প্রদেশের কবিগণের শব্দবৈচিত্র্যের অসামান্য নৈপুণ্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, কবি ভামহের গৌড়ীয় কাব্য-রীতি এবং দণ্ডীর কাব্যে অনুসৃত বিদর্ভ কাব্য-রীতি সংস্কৃত সাহিত্যের অতুলনীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। এই দুই কাব্য-রীতির মধ্যে কোনটি অধিকতর রসগ্রাহী সে প্রসঙ্গে উভয় কবির মধ্যে মতভেদ থাকলেও এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার একটি স্বতন্ত্র ধারা ক্রমশঃ বিস্তারলাভ করতে থাকে, যা সমগ্র ভারতবর্ষের বিদ্বজ্জনসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। খৃষ্টীয় নবম শতকের টীকাকার বামনের মতে, বৈদর্ভী বা গৌড়ী কাব্য-রীতির নামকরণ হয় যে অঞ্চলে এই রীতিগুলি প্রচলিত ছিল তদনুসারে। পরবর্তীকালে তা ওই আঞ্চলিক নামের তকমা নিয়েই একটি নির্দিষ্ট রীতিকে চিহ্নিত করতে সমগ্র ভারতবর্ষেই ব্যবহৃত হতে থাকে। যেমন গৌড়ী রীতির জন্ম হয় 'গৌড়' থেকে যা বাংলাদেশে অবস্থিত একটি অঞ্চল বলেই পরিচিত। এ থেকে নিঃসন্দেহে ধারণা করা যেতে পারে, প্রাচীন বাংলাদেশ সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রমবিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল।

অপরপক্ষে, বাঙালী কবি বা সাহিত্যিকদের যে সকল সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া গেছে কিন্তু অত্যন্ত নিরাশাব্যঞ্জক। লিপিমালার সাক্ষ্যপ্রমাণ অবশ্য সংস্কৃতের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের রচনার সপ্রশংস উল্লেখ করেছে, বেদ, বেদান্ত, প্রমাণ, আগম, নীতি, জ্যোতিষ, মীমাংসা, তর্ক এবং ব্যাকরণের একাধিক শাখায় তাদের সাবলীল বিচরণের কথাও এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। রাজা হরিবর্মনের মন্ত্রী ভট্ট

Scanned by CamScanner

ভবদেবের পাণ্ডিত্যের কথাও তাঁর লিপি থেকে জানা যায়। এই লিপিতে আরও বলা হয়েছে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ভট্ট ভবদেব দর্শনের ব্রহ্মাদ্বৈত শাখায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং কুমারিল ভট্টের রচনার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র এবং গণিতে, জ্যোতিষবিজ্ঞান (ফলসংহিতা) প্রভৃতিতে অসামান্য ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন।

৩.০ দক্ষিণ ভারত ঃ আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্য ঃ তামিল

দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষা হল তামিল। যে চারটি দ্রাবিড় ভাষায় উন্নত শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তামিলে। এই নিদর্শনসমূহের প্রাচীনতম হল 'তোলকাপ্পিয়াম্' নামক একখানি বিশিষ্ট ব্যকরণ গ্রন্থ, এই গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক।

দীর্ঘকালব্যাপী তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে শুধুমাত্র দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যেই নয়, ভারতবর্ষে অন্যান্য ভাষাসমূহের মধ্যেও তামিল প্রাচীনতম বলে বিবেচিত। তবে বিভিন্ন যুগে এই ভাষার রূপগত বিবর্তন ঘটেছে—আদি তামিল, পুরাতন তামিল, প্রাচীন তামিল, মধ্যযুগীয় তামিল, আধুনিক তামিল প্রভৃতি প্রয়োগ থেকেই এই ভাষাটির ব্যকরণগত বিভিন্নতা অনুমান করা যায়।

অন্যান্য আর্যেতর ভারতীয় ভাষার মত তামিলেও সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। তবে মালয়লম, কন্নড় বা তেলুগুর মত সমৃদ্ধ দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে যে পরিমাণ সংস্কৃতের প্রভাব পড়েছে, সে তুলনায় তামিলের উপর সংস্কৃতের প্রভাব সামান্যই বলা যায়। বর্তমান কালের দ্রাবিড়গোষ্ঠীর প্রতিনিধিমূলক ভাষা হল তামিল। মূল দ্রাবিড় ভাষার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত আছে তামিলে।

আনুমানিক দুই হাজার বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ তামিল ভাষা সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি থেকে এবং সংস্কৃত তথা ভারতীয় আর্যভাষা থেকে কিছু কিছু শব্দ ও রীতি গ্রহণ করেও তামিল সাহিত্য একটি দক্ষিণ দ্রাবিড়ীয় ধারা রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

তামিল ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরের ইতিহাসকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—(১) আদি তামিল (খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক) (২) প্রাচীন তামিল বা ক্লাসিক তামিল (পড়ন-তমিড়, চেন-তমিড়)—খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পল্লব, চালুক্য ও চোড় সাম্রাজ্যের সময়কালে রচিত। এছাড়া পরবর্তী যুগে আরও কতকগুলি স্তরবিন্যাস করা হয়েছে।

আদি তামিল সাহিত্যকে 'সংগম' সাহিত্য ও বলা হয়। অতি প্রাচীনকাল থেকেই তামিল ভাষায় সাহিত্য চর্চার ও কবি সম্বর্ধনার জন্য সাহিত্যসভা বা সঙ্গাম আহ্বান করার রীতি প্রচলিত ছিল। পণ্ডিতগণের মতে খৃষ্টজন্মের অব্যবহিত আগে বা পরেই সঙ্গাম কবিরা কাব্য রচনা করেছিলেন কিন্তু তাদের রচনা পাওয়া গেছে প্রাচীন তামিলে। সর্বপ্রাচীন তামিল পুস্তকের কাল সম্ভবত খৃষ্টীয় ১ম শতক। সংগম যুগের তামিল সাহিত্যের নিদর্শন বেশীর ভাগই সংকলন—গ্রন্থকারে পাওয়া গেছে—দুটি প্রধান সংকলনের মধ্যে প্রথমটি

Scanned by CamScanner

হল পত্তুপপাট্টু বা গীতিকাব্য দশক। এই কবিতাগুলি আটজন কবির দ্বারা রচিত। এগুলি প্রথম খৃষ্টীয় শতকের দ্বিতীয় ভাগের বিভিন্ন রাজগণকে উৎসর্গীকৃত।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের পর রচিত হয় আঠারোটি নীতিগর্ভ কবিতার সংকলন 'পতিতেন কীড় ক্‌-কণক্কু'। এই সংকলনের কবিতাগুলি ক্ষুদ্র এবং দ্বিপদী। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল তিরু-ভাল্লুবার এর রচিত 'কুরল'। এই কাব্যটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

গুপ্তযুগের ও পল্লব সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানের উদ্দীপনা তামিল সাহিত্যে গৌরব এনে দিয়েছিল। শৈব সন্তদের দ্বারা রচিত শৈব স্তোত্র ও কবিতাগুলিকে খৃষ্টীয় একাদশ শতকে নম্পিয়ন্টার নম্পি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। এই সংকলনগুলিকে বলা হয় 'তিরুমুরৈ'। অষ্টম 'তিরুমুরৈ'-তে যে ভক্তিস্তোত্র আছে তার রচয়িতা মাণিক্ক বাচকর নামক একজন শৈব সন্ত। সঙ্গামযুগের দুটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল—'চিলপ-পতিকরম' এবং 'মণি-মেকলৈ'।

তামিল দেশের আঠারোজন বৈষ্ণব সন্ত কর্তৃক রচিত ৪০০০ স্তোত্রের সংকলন করেন শ্রীনাথমুণি (খৃষ্টীয় একাদশ শতক)। তামিল বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে আন্ডাল, আন্টাল বা গোদা নামক একজন মহিলা কবিও আছেন যাঁর তিরিশটি কবিতা 'তিরুপপাবৈ গ্রন্থে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকের কালপর্বে কয়েকজন বিখ্যাত কবির আবির্ভাব হয়েছিল।

৩.১.১ দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশ

প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধির দিক থেকে দ্রাবিড় ভাষাসমূহের মধ্যে তামিলের পরেই তেলুগুর স্থান। ভারতবর্ষের যে অঞ্চলে তেলুগু ভাষার প্রচলন তা 'আন্ধ্র' নামে পরিচিত। 'আন্ধ্র' শব্দটি মূলত জাতিবাচক হলেও প্রাচীনকালে এটি একটি ভাষাকেও বোঝাত। পরবর্তীকালে আন্ধ্র অঞ্চল ও তার ভাষা 'তেলেঙ্গা' নামে পরিচিত হয়, 'তেলেঙ্গা' থেকেই 'তেলুগু'-র উৎপত্তি। মার্জিত চারটি দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে মূল দ্রাবিড় থেকে প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তেলেগু। এই কারণে তামিল ও মালয়লম্ ভাষীদের কাছে তেলেগু অনেকটা দুর্বোধ্য।

একাদশ শতকের মধ্যভাগে নন্নয় ও নারায়ণ ভট্টের রচিত চম্পূকাব্য 'মহাভারত' সম্ভবত অন্ধ্র সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন ফসল। নন্নয় মাত্র আড়াই পর্বে এই কাব্য অসমাপ্ত রাখেন। পরবর্তী দুই শতাব্দী অতিক্রান্ত হবার পর তিক্কন বিরাটপর্ব থেকে স্বর্গারোহণ পর্ব রচনা করেন। আরও ৭৫ বৎসর পর এররাপ্রগড নামে এক কবি অরণ্যপর্ব এবং হরিবংশও সম্পূর্ণ করেন। তিনি নিজে একটি রামায়ণও রচনা করেন। তেলুগু সাহিত্যে এঁরা 'কবিত্রয়' নামে সুপরিচিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পালকুরিকি সোমনাথের নেতৃত্বে বীরশৈব কবিরা সংস্কৃতভাষার প্রভাব মুক্তির আন্দোলন করেন। তাঁর অনেক গ্রন্থের মধ্যে 'পণ্ডিতারাধ্যচরিত্রম' ও বাসবপুরাণ' উল্লেখযোগ্য।

'কন্নড়' বা কানাড়া দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত চারটি দ্রাবিড়ভাষার অন্যতম। কালো মাটির দেশ বলে 'করু' (কালো) নাড়ু (দেশ) এই দুটি শব্দ থেকে এই দেশবাচক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক

Scanned by CamScanner

থেকে কন্নড় ভাষার নিদর্শন পাওয়া গেলেও কন্নড় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হল খৃষ্টীয় নবম শতকে রচিত কবি শ্রীবিজয়-এর অলংকার গ্রন্থ 'কবিরাজমার্গ', ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে কানাড়ী সাহিত্য চারটি পর্বে বিভক্ত, যার প্রথমটি হল আদি যুগ (খৃষ্টীয় নবম শতক পর্যন্ত) এবং দ্বিতীয়টি হল আদি মধ্য যুগ (৮০০-১১৫০ খৃষ্টাব্দ)। তৃতীয় পর্বের নাম মধ্যযুগ যার ব্যাপ্তি ১১৫০-১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত চতুর্থ এবং শেষ ভাষা হল মালয়লম্। এটি সম্ভবত নবম শতক থেকে প্রাচীন তামিল ভাষা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সেইজন্যই তামিল ও মালয়লম ভাষার সাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ। ভারতের অন্যতম স্বীকৃত জাতিয় ভাষা হিসাবে কেরল বা প্রাচীন চের প্রদেশ জুড়ে এই ভাষা ব্যবহৃত। প্রাচীন স্তরে তামিল ও মালয়লম্ সাহিত্যিক ঐতিহ্য অভিন্ন। মালয়লম্ ভাষায় চতুর্দশ খৃষ্টীয় শতকের আগে কোনো সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। প্রকৃত সাহিত্য রচনার শুরু চতুর্দশ শতক থেকে, এই সময় থেকে সংস্কৃতাদর্শ অনুকরণে গদ্য-পদ্য মিশ্রিত চম্পূকাব্যও গড়ে উঠেছিল।

৪.০ আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব ও সাহিত্যের বিকাশ ঃ পূর্বভারত

পূর্বভারতে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব হয় সম্ভবত মগধে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা থেকে যার আনুমানিক সময়কাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতক। বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, ভোজপুরী বা মৈথিলী ভাষা প্রাকৃতভাষার বিবর্তনের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাভাষাসহ অন্যান্য পূর্বভারতীয় ভাষা আর্য ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত। এই ভাষা সমূহের উৎপত্তি সূত্রটি এইরূপ ঃ

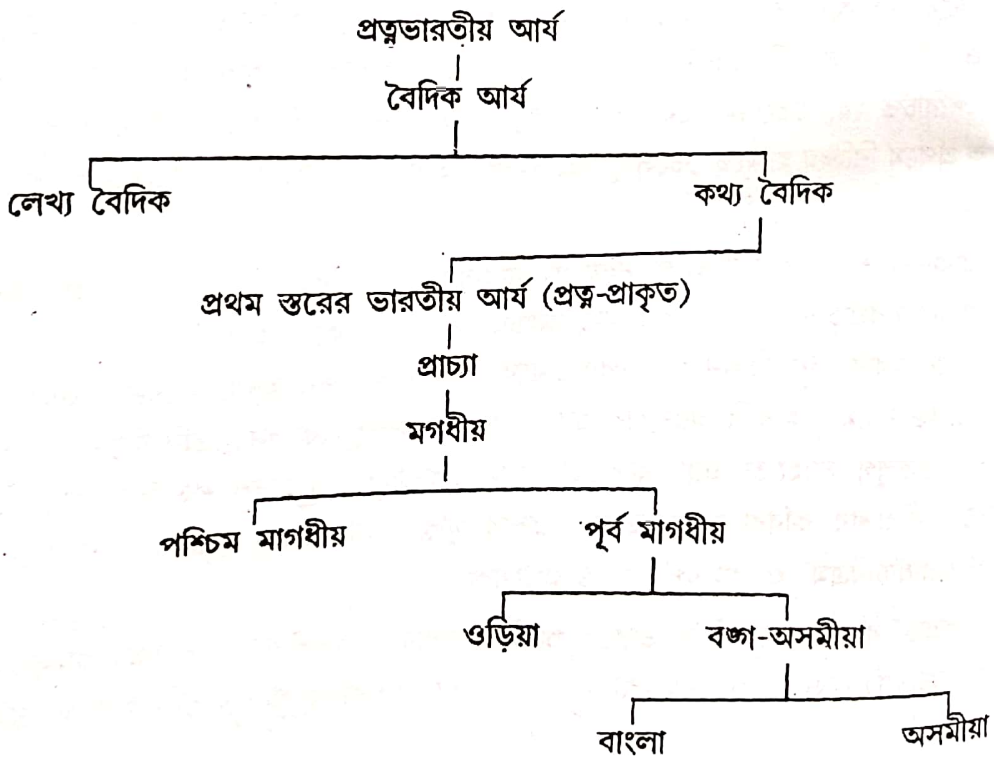

Scanned by CamScanner

বাংলাভাষার উৎপত্তিকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী। এই ভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তিনটি সুস্পষ্ট স্তর লক্ষিত হয়, আদি, মধ্য ও নব্য বা আধুনিক। আদি স্তরের বাংলাকেই প্রাচীন বাংলাভাষা বলা হয়ে থাকে। বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল ৯৫০ খৃষ্টাব্দ—১৩৫০ খৃষ্টাব্দ। প্রাচীন বাংলাভাষার প্রধান নিদর্শন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কৃত 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' পুঁথিতে সংকলিত গীতগুলি। সম্ভবত খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত এই চর্যাগীতি সম্বলিত গ্রন্থ বা পুঁথি আচার্য শাস্ত্রীমহাশয় নেপাল থেকে উদ্ধার করে আনেন। এই প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহতে বিধৃত চর্যাগীতির ভাষাতেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাচীনতম বাংলাভাষার লক্ষণগুলি খুঁজে পান।

বাংলা অক্ষরের উৎপত্তি ব্রাহ্মীলিপি থেকে। সপ্তম শতকে ব্রাহ্মীলিপি তিনটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। (১) 'শারদা', 'নাগর' ও 'কুটিল'। মূল ব্রাহ্মীলিপির 'কুটিল' রূপভেদ থেকে বাংলা অক্ষরের জন্ম।

৫.০ পশ্চিম ভারত ঃ গুজরাটী ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ

গুজরাটী ভাষা একটি আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা যা গুজরাট-কাথিয়াবাড় অঞ্চলে ব্যবহৃত। রাজস্থান বিশেষত মাড়বাড়ী ভাষার সঙ্গে এর প্রচুর সাদৃশ্য আছে। দেবনাগরী থেকে কিছুটা পৃথক এর নিজস্ব লিপি আছে। অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত এই ভাষা চালুক্য রাজগণের সময় থেকেই সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে এবং এর বিস্তারের ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়। ভারতবর্ষে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বেই গুর্জর অপভ্রংশ আধুনিক গুজরাটী রূপ লাভ করে এবং মারোয়াড়ী নামে এর একটি অপ্রচলিত শাখার উৎপত্তিও এই সময়ে। গুজরাটী সাহিত্য বিশিষ্ট রূপ লাভ করার সাথে সাথে ব্রজের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এটি স্বীয় স্বাতন্ত্র্যরক্ষার চেষ্টা করে। এই পরিবর্তন চরম রূপ লাভ করে ১২৫০ থেকে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে।

আচার্য হেমচন্দ্র (১০৮৯—১১৭৩ খৃষ্টাব্দ) তাঁর প্রাকৃত ব্যকরণে বিশদ উদাহরণসহ অপভ্রংশের ব্যকরণও আলোচনা করেছেন। হেমচন্দ্রের পর থেকে গুজরাটী সাহিত্যের উপর সংস্কৃত এবং প্রাকৃত গাথার বিশেষ প্রভাব দেখা যায় সর্বোপরি এই সাহিত্যে জৈনধর্মের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই যুগে রামচন্দ্র, সোমেশ্বর বস্তুপাল এবং তেজপাল প্রমুখ সংস্কৃত পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। এই কালপর্বে এমন লেখকেরও সন্ধান মেলে যাঁরা সমসাময়িক চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন। 'স্থূলিভদ্র ফাগু' (১৩৩৪ খৃষ্টাব্দ) এবং 'বসন্তবিলাস' (আনুমানিক ১৩৫০ খৃষ্টাব্দ) ইত্যাদি ফাগুজাতীয় কাব্য এই সময়ে রচিত হয়। 'নেমিনাথ চতুষ্পাদিকা' (১২৬৯ খৃষ্টাব্দ) নামক ক্ষুদ্র কবিতা বা 'eclogue' এবং 'রেবন্তগিরিরাস' (১২৩১ খৃষ্টাব্দ) নামক রাসকাব্য এই যুগের সৃষ্টি। রাসের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ রচনার প্রচেষ্টাও স্মরণীয়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পদ্মনাভের 'কাহ্নড়দে প্রবন্ধ' (১৪৫৬ খৃষ্টাব্দ)। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের পরবর্তী যুগে গুজরাটী সাহিত্য জৈন প্রাধান্য থেকে মুক্ত হয় মূলত হিন্দু-প্রাধান্যের ফলে।

Scanned by CamScanner

৬.০ উত্তর ভারত ঃ আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ

গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষাগুলির সাধারণ নাম হিন্দী। হিন্দীভাষাগুচ্ছ দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগ পশ্চিমা হিন্দী, তার অন্তর্গত ভাষা হল ব্রজভাষা, কনৌজী বঙ্গারু বা হরিয়ানী এবং আম্বালা থেকে রামপুর পর্যন্ত প্রচলিত হিন্দুস্থানী। অপর ভাগ পূর্বী হিন্দী, তার মধ্যে পড়ে অবধী বা কোশলী বা বইসওয়াড়ী, বখেলি এবং ছত্তিশগঢ়ী।

ফারসী হরফে লেখা উর্দু এবং দেবনাগরী হরফে লেখা এখনকার হিন্দী ভাষা হিন্দুস্তানী থেকে উদ্ভূত। 'হিন্দী' শব্দটির প্রাচীন রূপ হিন্‌দ্বী। এই শব্দটি এসেছে 'হিন্দবী' থেকে এবং সেই শব্দটির মূল হল মধ্যপারসিক (পহ্‌লবী) 'হিন্দুগী' অর্থাৎ সিন্ধু অঞ্চলের ভাষা।

হিন্দী সাহিত্যের ত্রিকাল হল প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক কাল। অপভ্রংশের পর প্রাচীন হিন্দীকাব্যের কালকে 'বীরগাথাকাল' নামে অভিহিত করা হয় যার কালপর্ব খৃষ্টীয় দশম থেকে চতুর্দশ শতক। এই বীরগাথাগুলির মধ্যে কবি চন্দ বরদাঙ্গ বিরচিত 'পৃথ্বীরাজ রসো' (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক) সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। প্রাচীন যুগের হিন্দী কবিগণের মধ্যে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের কবি আমীর খসরুর রচনার বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ব্যপ্ত মধ্যযুগ হিন্দী সাহিত্যের স্বর্ণযুগ রূপে বিরাজমান।

৭.০ কথান্ত

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কালপর্বে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য আভিজাত্যের নিরিখে অনন্য স্তরে আরোহণ করেছিল; রাজকীয় ভাষা রূপে, রাজণ্যবর্গের ভাষা রূপে দরবারে সংস্কৃতের মর্যাদা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রবণতা দেখা যায়, প্রথমদিকে সেগুলি উৎকর্ষতার মাপকাঠিতে নগণ্য হলেও কালক্রমে দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত, পশ্চিম এবং উত্তর ভারতে স্থানীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথে উত্তরণ ঘটে, যার বর্ণনা উপরিউক্ত এককটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

৮.০ অনুশীলনী

১। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আঞ্চলিকতার বোধটি কখন জন্ম নেয় এবং কেন।

২। খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত সময়কালের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩। আঞ্চলিক ভাষার ও লিপির উদ্ভব সম্পর্কে কি জানেন?

৪। সংস্কৃত সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ কিভাবে ঘটে?

Scanned by CamScanner